গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৫ সংখ্যা | ২৭ আগস্ট - ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মার্কিন শাসকরাই আফগানিস্তানকে তালিবানি অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, মার্কিন অর্থনীতি ভয়াবহ আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত, দেশের অভ্যন্তরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধবাজ নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকার জনগণের তীব্র ক্ষোভ ফেটে পড়ছে। এই অবস্থায় তাদের হাতের পুতুল চরম দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জনবিচ্ছিন্ন আফগান সরকারকে টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই সময়ের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামি মৌলবাদী শক্তি তালিবানের হাতে আফগানিস্তানের ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। একসময় আফগানিস্তানের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেই যে তালিবানকে লালন পালন করেছে, আজ নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী মতলব হাসিল করতে সেই শক্তিকে তারা কাজে লাগাচ্ছে। গভীর দুঃখ-ব্যথায় বিশ্বের মানুষ দেখছে, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে মার্কিন শাসকরা আফগানিস্তানের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে চূড়ান্ত মধ্যযুগীয় এক শক্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে যাদের একমাত্র অস্ত্র বর্বর বলপ্রয়োগ করে জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখা।

আমাদের গভীর আশঙ্কা, তালিবানের এই ক্ষমতা দখল শুধু যে এক নিষ্ঠুর মধ্যযুগীয় ইসলামিক শাসন কায়েম করে আফগান জনগণের সমস্ত গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে পিষে মারবে তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বেই ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলি আরও ক্ষমতাশালী হবে। শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এরা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ফ্যাসিস্ট শাসকদের মদতে দেশে দেশে বৈজ্ঞানিক-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের চর্চাকে বাধা দেবে যাতে বিপ্লবী আন্দোলনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা যায়।

আমাদের আশা, আফগানিস্তানের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে উঠে দাঁড়াবে এবং এই প্রতিক্রিয়াশীল তালিবান জমানাকে রুখে দিয়ে তারা সে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, এই সঙ্কটের সময়ে আফগান জনগণের পাশে দাঁড়ান।

চাকরির দাবিতে মধ্যপ্রদেশে যুব বিক্ষোভে লাঠিচার্জ শতাধিক গ্রেপ্তার

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের রাজপথে যুবকদের রক্ত ঝরালো সে রাজ্যের বিজেপি সরকারের বর্বর পুলিশ বাহিনী। ১৮ আগস্ট এ আই ডি ওয়াই ও এবং মুভমেন্ট এগেনস্ট আনএমপ্লয়মেন্ট-এর ডাকে ভোপালে হাজার হাজার যুবক যোগ দিয়েছিলেন এই যুব-বিক্ষোভ মিছিলে। তাঁদের দাবি, সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে, সমস্ত বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। তাঁরা চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে স্মারকলিপি দিয়ে বলতে— চার বছরের উপর মধ্যপ্রদেশে সরকারি

চারের পাতায় দেখুন

বিশ্বভারতী-উপাচার্যের স্বৈরাচারের প্রতিবাদ এআইডিএসও-র

সংহতি দিবসে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ

২১ আগস্ট সারা রাজ্যে বিশ্বভারতী সংহতি দিবস পালন করল এআইডিএসও। কেন্দ্রীয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপির মদতপুষ্ট উপাচার্য একের পর এক ছাত্রস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, গবেষকদের ভাতা বন্ধ রাখা, গুন্ডা লাগিয়ে ছাত্র পেটানো, ২৬ জানুয়ারি তাঁর বক্তৃতার ভিডিও করার জন্য এক ছাত্রকে হোস্টেল থেকে বহিষ্কার, ক্যাম্পাসে আধাসেনা মোতায়েনের চেষ্টা, যত্রতত্র কংক্রিটের পাঁচিল তোলা, পৌষমেলার মাঠ ঘিরে ফেলা, ঐতিহ্যবাহী আলাপিনী মহিলা সমিতির ঘর কেড়ে নেওয়া, সেন্ট্রাল অফিস চত্বরকে 'নো ডিস্টার্ব জোন'-এ পরিণত করে ছাত্র আন্দোলনে লাগাম পরানোর চেষ্টা, কনভোকেশন সহ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে বিজেপির দলীয় লোকজনকে আমন্ত্রণ, অমর্ত্য সেন সহ আশ্রমিকদের প্রতি রুচিহীন কদর্য আচরণ, অনৈতিকভাবে কর্মী ছাঁটাই ও বদলি, সিএএ নিয়ে প্রচার করতে বিজেপি সাংসদকে আমন্ত্রণ, 'পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ের কারণ' শীর্ষক

আটের পাতায় দেখুন

বিভেদ বাড়াতেই 'বিভীষিকা'র স্মরণ

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! যারা দেশভাগের হোতা ছিলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আজ তারাই দেশভাগের দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছেন। তাদেরই উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৪ আগস্ট দিনটিকে 'দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস', হিসাবে পালন করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'দেশভাগের দুঃখ ভোলা যায় না। লাখো ভাইবোনেরা ঘরছাড়া হয়েছেন। ঘৃণা ও হিংসার শিকার হয়ে বহু মানুষ জীবন দিয়েছেন। সেই সব মানুষের দুঃখে কাতর প্রধানমন্ত্রীর আবেদন—'দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস' যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সামাজিক বিভাজন, বিভেদের বিষকে মুছে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে।'

৭৫ বছর পর ইতিহাস খুঁড়ে দেশভাগের বীভৎস স্মৃতির কথা প্রধানমন্ত্রী আজ হঠাৎ তুলে আনলেন কেন? সাম্প্রদায়িক হিংসা, মৃত্যু, দেশত্যাগ, সর্বস্ব হারানোর বীভৎস স্মৃতি তো মানুষ আজ প্রায় ভুলতে বসেছে। তাকে আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া কেন? বিভাজন, বিভেদের বিষ মুছে ফেলার জন্যই কি প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা? এই যুক্তি দেশের মানুষ মেনে নিত যদি তাঁর নেতৃত্বে সাত বছরের ইতিহাস এর ঠিক বিপরীত আচরণে কালো না হয়ে উঠত। তাঁর শাসনে বিভাজন ও বিভেদ কি আরও তীব্র করে তোলা হয়নি? সম্প্রীতি ধ্বংস করা হয়নি? সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের যে উদ্দেশ্যের কথা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তা কি মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, বেকারি, অশিক্ষা আর চিকিৎসাহীনতায়

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিভেদ বাড়াতেই ‘বিভীষিকা’র স্মরণ

একের পাতার পর

জর্জরিত মানুষের কানে বিদ্রুপের মতো শোনায় না?

এই প্রধানমন্ত্রীই তো এনআরসি-সিএএ-র মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভেদের বীজ পাকাপোক্তভাবে রোপন করার ব্যবস্থা করেছেন, বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপর রামমন্দির নির্মাণ এবং কাশ্মীরের মানুষের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের মানুষের সাথে বাকি ভারতের দূরত্বের বাতাবরণ তৈরি করেছেন। তিনিই আজ ঘৃণার বিষকে মুছে ফেলার কথা বলছেন! একে ভণ্ডামি ও দ্বিচারিতা ছাড়া আর কী বলা যায়?

এত দিনের রাজত্বের পর তাঁকে এই ভণ্ডামির আশ্রয় নিতে হচ্ছে কেন? সামনেই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি গোহারা হেরেছে। এর কারণ কেন্দ্রে বিজেপি শাসন জনসাধারণের জীবনে শুধু ব্যর্থতাই নিয়ে আসেনি, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের তুষ্ট করতে গিয়ে জনসাধারণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। দেশজুড়ে বিজেপি শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বেড়ে চলেছে। তাই উন্নয়নের, বিকাশের কোনও ছেঁদো প্রতিশ্রুতিতেই যে তাঁদের অপরাধ ঢাকা যাবে না, তা বিজেপি নেতারা ভালই বোঝেন। এই অবস্থায় বিজেপি নেতাদের হাতে একটি অস্ত্রই আছে। তা সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র। যে অস্ত্র ব্যবহার করে তাঁরা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে হিন্দুত্ববাদের আবেগকে উস্কে তুলতে চান। বিজেপির উচ্চবর্ণ ঘেঁষা রাজনীতিকে ঐক্যের আলখাল্লা পরিয়ে নিম্নবর্ণের ত্রাতা সাজতে চান, যাতে ভোটব্যাঙ্ক বড় হয়। তাই দেশভাগের স্মৃতি উস্কে তোলা।

অথচ যে দেশভাগের দুঃখে কাতর হয়ে তিনি অশ্রুমোচন করেছেন, সেই দেশভাগের প্রকৃত ইতিহাস কী? দেশভাগের হোতা কারা? একপক্ষীয় প্রচারে মহম্মদ আলি জিন্নার নামই আলোচিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী যাদের প্রতিনিধি, সেই সংঘ পরিবার এটাই প্রচার করে প্রমাণ করতে চায় যে, মুসলমানরাই দেশ ভাগের জন্য দায়ী। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। ১৯৪০ সালে জিন্না এই দাবি তোলার তিন বছর আগেই অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে আরএসএস নেতা সাভারকার হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, “ইন্ডিয়া ক্যান নট অ্যাসিউমড টুডে টু বি এ ইউনিটেরিয়ান অ্যান্ড হোমোজিনিয়াস নেশন, বাট অন দ্য কনট্র্যারি দেয়ার আর টু নেশনস ইন দি মেইন, হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিমস, ইন ইন্ডিয়া,”। এর পরের বছর ১৯৩৮ সালে সাভারকার তাঁর ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ গ্রন্থেও দ্বিজাতি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। ১৯৪০ সালে জিন্না যখন দ্বিজাতির প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখনও হিন্দু মহাসভা তা সমর্থন করে।

এই প্রশ্নে অবিভক্ত সিপিআই-এর ভূমিকা উল্লেখ না করলে এ প্রসঙ্গে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কমিউনিস্ট নামধারী এই দলটি সঠিক কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে না পারার জন্য জাতি গঠনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটিই ধরতে পারেনি। ফলে মহান লেনিনের ‘নিপীড়িত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার’ থিসিসটির ভুল ব্যাখ্যা করে সিপিআই বলে যে, হিন্দু ও মুসলমান—দুটি জাতি এবং সেজন্যই তাদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি ন্যায়সঙ্গত। এই দাবিকে সামনে রেখে তারা সেই সময়ে প্রকাশ্যে প্রচারও চালায়। এমন ঘটনাও দেখা গিয়েছিল যে, সিপিআই-এর লাল ঝান্ডার একদিকে কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা এবং আর একদিকে মুসলিম লিগের পতাকা লাগিয়ে তারা মিটিং করত।

জাতীয় কংগ্রেসের আপসকামী নেতৃত্ব দেশভাগ মেনে নিয়েছিল। তখন তাদের পিছনের আসল শক্তি জাতীয় বুর্জোয়ারা যে কোনও মূল্যে এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য উদগ্রীব। ফলে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করার যে নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিয়েছিল, তা কার্যকর করতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

উল্লেখ্য, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির হিন্দু সদস্যরা গান্ধীজির উপস্থিতিতে একযোগে যখন দেশভাগের পক্ষে সম্মতি জানিয়েছিলেন, তখন বলিষ্ঠভাবে দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন দু’জন মুসলিম সদস্য— সর্দার আব্দুল গফফর খান ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

তবে এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, সাধারণ মানুষ দেশভাগ মেনে নেয়নি। মুসলিম লিগ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করলেও সমগ্র মুসলিম সমাজ তাদের পিছনে ছিল না। একইভাবে হিন্দুত্ববাদীরা এই দাবি করলেও ব্যাপক অংশের হিন্দু জনসাধারণ এই দাবির বিরুদ্ধে ছিল।

তাই দেশভাগের ক্ষত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যখন চোখের জল ফেলেন, তখন তাঁর সততা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই দেশের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। যে সাভারকার দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা, সেই সাভারকারকে ‘মহান দেশপ্রেমিক’ বানানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে দেখা গেছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকেই। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গত সাত বছর ধরে সংখ্যাগুরুবাদের যে আধিপত্য চলছে, তার দায়িত্ব কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন? দেশভাগের যে ক্ষত নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছেন, সেই ক্ষত যে আজ দেশজুড়ে বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার দায়ও কি তাঁর নয়? তা হলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার আর কি উদ্দেশ্য আছে?

দেশে আজ মুখোশধারীদেরই প্রাধান্য। মুখোশের আড়ালে যে কুৎসিত মুখগুলো ঢাকা রয়েছে, তাকে চিনতে হলে প্রকৃত ইতিহাস চর্চার আজ বড় বেশি প্রয়োজন। রাষ্ট্র সেই সুযোগ আমাদের দেবে না। তাই স্ব-উদ্যোগে এই চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে আমাদের, প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিককে।

শিক্ষকদের শাস্তিমূলক বদলির প্রতিবাদ বিপিটিএ-র

৯ আগস্ট আদিবাসী দিবসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামে সভা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কতিপয় শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের ন্যায্য দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকপত্র দিতে যান। দাবি ছিল এস এস কে, পার্শ্বশিক্ষক ও চুক্তি-শিক্ষকদের চাকরির স্থায়ীকরণ করতে হবে। কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। পরে জানা যায়, এই আন্দোলনকারী শিক্ষকদের উত্তরবঙ্গে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। বদলির নির্দেশকে অনৈতিক আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তা বাতিল করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ২০ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, এই অনৈতিক বদলি দ্রুত প্রত্যাহার না করলে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন করা হবে।

ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ মধ্যপ্রদেশে

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টির ফলে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র, চম্বল, গুনা জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হাজারের বেশি গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। এই বন্যাদুর্গত মানুষদের ত্রাণ সাহায্যে সরকারের গাফিলতি চরম। এস ইউ সি আই (সি) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছে। এই দাবিতে অশোকনগর, গুনা, গোয়ালিয়রের জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভে বহু স্থানীয় মানুষ অংশ নেন। দলের পক্ষ থেকে গুনা জেলার বিভিন্ন কলোনি, গোয়ালিয়র জেলার পাঁচটি গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প ও ত্রাণ শিবির করা হয়।

জীবনাবসান

আসামে এস ইউ সি আই (সি)-র কাছাড় জেলা কমিটির পূর্বতন সম্পাদক ও গণআন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড প্রদীপ কুমার দেব ৬ আগস্ট রাতে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

কমরেড প্রদীপ কুমার দেব ১৯৮২ সালে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলের কাজ শুরু করেন। সেই সময় আসাম রাজ্য সম্পাদক, বর্তমান পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের সাহচর্য ও তত্ত্বাবধানে তিনি রাজনৈতিক কাজকর্মের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্লাব গড়ে তোলার কাজ করতে থাকেন। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালে দলের প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত শিলচর আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলনে তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সজল চৌধুরীর মৃত্যু হলে তিনি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন।

শিলচরের প্রাণকেন্দ্র ডাকবাংলো মোড়ে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হলে তিনি মূর্তি নির্মাণ কমিটির সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালে আসামে এনআরসি তৈরির নামে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বরাক উপত্যকার তিন জেলার নাগরিকদের নিয়ে ‘নাগরিকত্ব সুরক্ষা সংগ্রাম সমিতি’-র কাছাড় জেলা আহ্বায়ক হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে ২০১৮ সালে এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের ৪৩টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ‘নাগরিক অধিকার রক্ষা সমন্বয় সমিতি, আসাম’-এর কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ হিসাবে এবং আন্দোলন বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। ২০০৯ সাল থেকে শিলচর লামডিং রেলপথ ব্রডগেজ করার দাবিতে গড়ে ওঠা ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। পেশায় শিক্ষক কমরেড প্রদীপ দেব শিক্ষক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অবসর গ্রহণের পর পেনসনভোগীদের দাবি আদায়ে পেনসনার্স অ্যাসোসিয়েশনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। শিলচর শহরের পৌর সমস্যা সমাধানে ‘নাগরিক স্বার্থ রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের’ কার্যকরী সদস্য হিসাবে বহু আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেন। এ ছাড়াও জেলায় বামপন্থী আন্দোলনের একজন নেতা হিসাবে, মনীষীদের আদর্শের প্রসারে নানা কর্মসূচিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ২০১৪ সালের বিধানসভার উপনির্বাচনে এবং ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসাবে তিনি শিলচর বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

কমরেড প্রদীপ কুমার দেবের মৃত্যুতে গোটা বরাক উপত্যকায় প্রগতিশীল মানুষ ও বামপন্থী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত হয়ে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

১৪ আগস্ট শিলচরের মধ্য শহর সাংস্কৃতিক সংস্থার হলে তাঁর স্মরণসভায় দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের শোকবার্তা পাঠ করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চন্দ্রলেখা দাসের পক্ষে এবং দলের কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ জেলা কমিটি সহ নানা গণসংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কান্তিময় দেব।

কমরেড প্রদীপ কুমার দেব লাল সেলাম

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন আজও স্মরণ করব

প্রভাস ঘোষ

২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সমগ্র দেশের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ইংরেজিতে একটি আলোচনা করেন যা অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়। ৫ আগস্ট মহান এঙ্গেলসের ১২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সেই ইংরেজি আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। এবার দ্বিতীয় পর্ব।

— সম্পাদক, গণদাবী

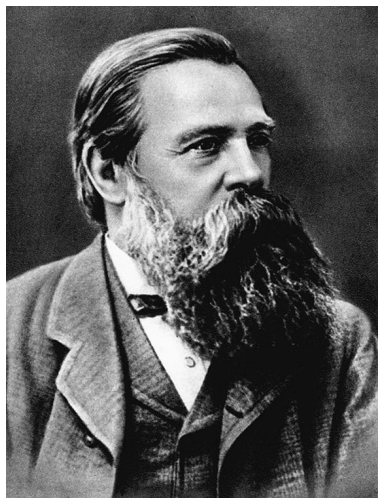

শেষ পর্যন্ত তাঁকে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে পাঠানো হয়। সেখানে একটা শিল্প-কারখানায় তাঁর পিতার অংশীদারি ছিল। পিতার সাথে তাঁর গুরুতর মতপার্থক্য ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন ধর্মীয় মানসিকতার এবং এঙ্গেলস ছিলেন ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এঙ্গেলস খুবই দুঃখের সঙ্গে মার্কসকে লিখেছিলেন, "আমার মা, যাঁকে আমি খুব ভালবাসি, না থাকলে চলে আসার ক'দিন আগে পর্যন্ত আমি সেই পরিবেশ সহ্য করতে পারতাম না। আপনি ধারণা করতে পারবেন না ... । এটা বিশেষভাবে ঘৃণ্য যে, শুধুমাত্র বুর্জোয়া হিসাবে নয়, কারখানার মালিক হিসাবে থাকা, অর্থাৎ এমন এক বুর্জোয়া যে সর্বহারার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অবস্থান করে।"

মার্কসকে তিনি আরও লিখলেন, "আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিই এই দিয়ে যে, শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা সম্পর্কে আমার বই লেখার কাজে যুক্ত আছি" (মার্কস এঙ্গেলসের চিঠিপত্র)।

১৮৪৫ সালে লিখিত 'ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা' নামক সেই বইয়ে তিনি বললেন, "এই শ্রমিকদের নিজের সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই, বেঁচে আছে পুরোপুরি নিজেদের মজুরির উপর নির্ভর করে, যা দিয়ে কোনও মতে পেট চলে...। প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষ, এমনকি সবচেয়ে দক্ষ শ্রমিকও সব সময় কাজ হারানো ও অনাহারে থাকার আশঙ্কায় থাকে।... যেটা হল না খেতে পেয়ে মৃত্যু...। তাদের বসবাসের ঘরগুলো এত জঘন্যভাবে পরিকল্পিত, এত খারাপভাবে তৈরি, ... আলো-বাতাস ঢোকে না, ... স্যাঁতস্যাঁতে ... প্রত্যেক ঘরে কমপক্ষে একটা পুরো পরিবারকে ঘুমোতে হয় যতটা সম্ভব কম জায়গা নিয়ে...। সহজ কথায় বুর্জোয়া শ্রেণি বেঁচে থাকার সমস্ত উপাদানের উপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছে। সুতরাং সর্বহারারা আইনত ও বাস্তবতও বুর্জোয়া শ্রেণির দাস, যে শ্রেণি তাদের জীবন-মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করতে পারে... খামারের চাষিরা দিনমজুরে পরিণত হয়েছে, ... খামারের মালিকদের যখন প্রয়োজন, তখন তারা কাজ পায় এবং সেইজন্য কখনও কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তাদের কোনও কাজ থাকে না, বিশেষ করে শীতকালে... তাদের খাদ্য খুবই অপর্যাপ্ত এবং নিম্নমানের... ছেঁড়াখোড়া পোশাক, থাকার জায়গাও ঝুপড়ির মতো, আর জরাজীর্ণ...। তার ওপর তারা মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংঘবদ্ধ হতে পারে না...। এই মজুররা সেই জন্য এই বর্বর অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে, একটু ভাল, মানবিক অবস্থা নিশ্চিত করতে চেষ্টা চালাবেই, এবং এই চেষ্টা তারা করতে পারে না, যারা তাদের শোষণ করে সেই বুর্জোয়াদের স্বার্থের উপর আঘাত না করে... । কিন্তু বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখে তাদের অধিকারে থাকা সম্পদের শক্তি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে... আইন-কানুন... যা প্রণীত হয়েছে তাদেরই কল্যাণ ও সুরক্ষার উদ্দেশ্যে...। শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক আন্দোলন অনিবার্যভাবেই শ্রমিকদের এই উপলব্ধির দিকে ঠেলে দেবে যে সমাজতন্ত্রেই তাদের সর্বাঙ্গীন মুক্তি নিহিত।" (ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা)।

একটা ব্যাপার লক্ষ করুন, শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনযাপনের এই বিবরণ আমাদের দেশের মতোই এবং সারা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিও এই রকমই।

মার্কস এই বইখানা পড়ে মূল্যায়নে বললেন, "তিনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যর প্রকৃত চরিত্র সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।"

বইটির প্রশংসা করে লেনিন লিখেছিলেন, "এঙ্গেলসের আগেও অনেকেই সর্বহারার দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন তাদের সাহায্য করা কত প্রয়োজন। এঙ্গেলসই সর্বপ্রথম বললেন যে, সর্বহারা শ্রেণি শুধুমাত্র একটা নিপীড়িত শ্রেণিই নয়, বস্তুতপক্ষে মর্যাদাহানিকর অর্থনৈতিক অবস্থাই শ্রমিকদের অপ্রতিরোধ্যভাবে সামনের দিকে পরিচালিত করবে এবং বাধ্য করবে চূড়ান্তভাবে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে...। শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রাম অনিবার্যভাবে শ্রমিকদের এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে পরিচালিত করবে যে তাদের মুক্তি একমাত্র সমাজতন্ত্রেই নিহিত। এই বইটি পুঁজিবাদের এবং বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অভিযোগ দায়ের করে এবং গভীর প্রভাব ফেলে। আধুনিক সর্বহারা শ্রেণির প্রকৃত অবস্থার সবচেয়ে ভাল চিত্র তুলে ধরায় এঙ্গেলসের এই বই সর্বত্রই উদ্ধৃত হতে থাকে। এবং এটা ঘটনা যে, ১৮৪৫ সালের আগে বা পরে শ্রমিক শ্রেণির এমন শোচনীয় দুর্দশার বিবরণ আর কোনও বইয়ে প্রকাশিত হয়নি।" (১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লিখিত)।

যৌথ পথ চলার সূচনা

এঙ্গেলস মার্কসকে প্রথম দেখেছিলেন ১৮৪২ সালে কোলনে রাইনৎসে জাইটুং পত্রিকার অফিসে। কিন্তু সেখানে তাদের মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ হয়নি।

১৮৪৪ সালে মার্কস ও আর্নল্ড রুগে-র যুগ্মভাবে সম্পাদিত জার্নাল জার্মান-ফ্রান্স ইয়ারবুক-এ প্রকাশিত এঙ্গেলসের লেখা 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনার রূপরেখা' প্রবন্ধের মাধ্যমে মার্কস সর্বপ্রথম এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে পারেন। ১৮৪৪ সালে এঙ্গেলস যখন ইংল্যান্ড থেকে প্যারিসে গেলেন, তিনি মার্কসের সাথে দেখা করলেন। এখানে নিজেদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তারিতভাবে মত বিনিময় সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "সমস্ত তত্ত্বগত ক্ষেত্রে আমাদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং আমাদের যৌথ কর্মকাণ্ড শুরু হল ঠিক তখন থেকেই।" এই সাক্ষাৎকার ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ তখন পর্যন্ত যা সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা বলেই মনে করা হত— মানবসভ্যতায় নিপীড়িত শ্রেণির মুক্তি ও শ্রেণিশোষণের চিরতরে অবসান ঘটানো— তার পথনির্দেশ ঘোষণা করার জন্য দুই মহান মানুষের এক ঐতিহাসিক যৌথ সংগ্রামের সূচনা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল।

কীভাবে দুই মহান মানুষের আদর্শগত ঐক্য বিকশিত হল

মার্কস ১৮৫৯ সালে তাঁর 'রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সমালোচনায় একটি অবদান' নামক একটি নিবন্ধের ভূমিকা লিখেছিলেন। সেই নিবন্ধের ভূমিকায় মার্কস লিখলেন,

"অর্থনৈতিক বিভাগের (ইকনমিক ক্যাটেগরিজ) সমালোচনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের চমৎকার নিবন্ধটি প্রকাশের পর থেকে নিয়মিত পত্রালাপের মাধ্যমে আমি তাঁর সঙ্গে ভাব-বিনিময় রক্ষা করেছি, তিনি অন্য পথ দিয়ে আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলেন (লক্ষ করুন— 'অন্য পথ দিয়ে আমার মতো একই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলেন')। এরপর ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে যখন তিনি ব্রাসেলসে এসে বসবাস করতে লাগলেন, তখন আমরা স্থির করলাম যে জার্মান দর্শনের ভাবগত মতামতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্যটি আমরা যুক্তভাবে প্রস্তুত করব, বস্তুতপক্ষে, আমাদের এতদিনকার দার্শনিক বিচারবুদ্ধির সঙ্গে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেব।"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে ১৮৮৮ সালে এঙ্গেলসও 'কমিউনিস্ট লিগের ইতিহাস'-এ লিখলেন ঃ

"আমি যখন ম্যাঞ্চেস্টারে ছিলাম তখন আমাকে ঠেকে শিখতে হয় যে, এতদিন পর্যন্ত যদিও ইতিহাস রচনায় অর্থনৈতিক তথ্যাবলি কোনও স্থানই পায়নি বা নিতান্ত তুচ্ছ স্থান পেয়েছে, তবু, অন্তত আধুনিক জগতে তা এক নির্ধারক ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অর্থনৈতিক তথ্যাবলিই হল আজকের দিনের শ্রেণিবিরোধ উদ্ভবের ভিত্তি। ... এইসব শ্রেণিবিরোধ ... আবার রাজনৈতিক পার্টি গঠনের ও পার্টি সংঘাতের, আর তার ফলে সব রাজনৈতিক ইতিহাসেরও ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কসও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন শুধু তাই নয়, ... তিনি এই মর্মে সাধারণীকরণ হাজির করেন যে, সাধারণভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্র নাগরিক সমাজকে (বুর্জোয়া সমাজকে) নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না বরং সমাজই রাষ্ট্রকে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই কারণেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার বিকাশ থেকেই রাজনীতি ও তার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিপরীতভাবে নয়। ১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে যখন আমি প্যারিসে মার্কসের সঙ্গে দেখা করি তখন তত্ত্বগত সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্ণ মতৈক্য পরিষ্কার হয়ে উঠল, আর তখন থেকেই শুরু হয় আমাদের মিলিত কাজ। ১৮৪৫ সালের বসন্তকালে ব্রাসেলসে আবার যখন আমাদের দেখা হয় তার মধ্যেই মার্কস উপরিউক্ত ভিত্তি থেকে তাঁর ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্বকে, তার প্রধান দিকগুলিকে বিকশিত করে তুলেছেন এবং আমরা এই নব-অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিকে সমস্ত দিকে বিশদে রচিত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

এই যে আবিষ্কারটি ইতিহাস-বিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছিল, সেটা আমরা দেখেছি প্রধানত মার্কসেরই কীর্তি— যে আবিষ্কারে আমি খুবই নগণ্য অংশ দাবি করতে পারি— তা কিন্তু সমকালীন শ্রমিক আন্দোলনে ছিল প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।"

এঙ্গেলস যখন প্যারিসে পৌঁছালেন, মার্কস ইতিমধ্যেই সেখানে পবিত্র পরিবার (দ্য হোলি ফ্যামিলি) নামক একটা বিতর্কমূলক রচনা প্রস্তুত করছিলেন। এই রচনায় এঙ্গেলসের তেমন কিছু অবদান না থাকলেও মার্কসের জোরালো পরামর্শেই ১৮৪৫ সালে তাঁদের যুগ্মরচনা হিসাবে লেখাটা প্রকাশিত হল। পরে আবার ১৮৪৬ সালে তাঁরা যৌথভাবে লিখলেন জার্মান ইডিওলজি, যেখানে তাঁরা ভাববাদী এবং কাল্পনিক ধ্যানধারণাগুলির বিরুদ্ধতা করে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

লেনিনের মতে মার্কস ও এঙ্গেলস দু'জনই আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা

এবার আমি মার্কস-এঙ্গেলস সম্পর্কে লেনিনের রচনা পড়ে শোনাব, কারণ এটাই হবে বেশি স্পষ্ট এবং খুবই শিক্ষণীয়— যা আমি নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। লেনিন লিখেছেন,

"বাস্তবে মার্কস এবং এঙ্গেলসের দুনিয়াজোড়া মহান অবদান হল, তাঁরা পুঁজিবাদের ধ্বংসের অনিবার্যতা এবং তার সাম্যবাদে উত্তরণকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন— যেখানে মানুষের দ্বারা মানুষের ওপর শোষণ থাকবে না।"

পাঁচের পাতায় দেখুন

মধ্যপ্রদেশে যুব বিক্ষোভে লাঠিচার্জ ঃ দেশ জুড়ে প্রতিবাদ

একের পাতার পর

চাকরিতে কোনও নিয়োগ হয়নি। রাজ্য সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া দিনের পর দিন ঝুলিয়ে রাখছে। অনেকে আত্মহত্যা করেছে। বেকারত্বের হারে মধ্যপ্রদেশ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। সরকারের কোনও হেলদোল নেই।

যুব মিছিল নীলম চক থেকে রোশনপুরা চৌরাস্তায় যাওয়ার পথেই পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বর লাঠিচার্জ করে। বহু যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পুলিশ তাদের পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় ও প্রবল মারধরের পর গ্রেপ্তার করে। মহিলারাও ছাড় পাননি। পুলিশের আক্রোশ বোঝা যায় আন্দোলনকারী যুবকদের উদ্দেশে তাদের গালিগালাজের বন্যায়। শতাধিক আন্দোলনকারী গুরুতর আহত হন। পুলিশ ১০০-র বেশি জনকে গ্রেপ্তার করে। যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে অথবা যেখানে ক্ষমতায় নেই সেখানে 'গণতন্ত্র' চেয়ে চোখের জল ফেলছে তাদের শাসনের বর্বর রূপ ১৮ আগস্ট নতুন করে দেখল ভোপাল। এ আই ডি ওয়াই ও দাবি করেছে অবিলম্বে সমস্ত দাবি মানতে হবে ও গ্রেপ্তার হওয়া আন্দোলনকারীদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা তুলে নিতে হবে। এই দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯ আগস্ট দেশজুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

ছবি ঃ ১) ১৮ আগস্ট ভোপালে উত্তাল যুব মিছিল, ২) এআইডিওয়াইও-র নেতাকে মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ ৩) রাজস্থানের পিলানিতে প্রতিবাদ দিবসে বিক্ষোভ মিছিল, ৪) গোয়ালিয়রে প্রতিবাদ দিবসে বিক্ষোভ

বির্তক ছাড়া বিল পাশ ঃ সংসদকে রাবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহার করছে সরকার

সংসদের সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে সরকার ও বিরোধী পক্ষের দ্বারা যা ঘটেছে, তা গণতন্ত্রের কলঙ্ক। এমনকি সংবাদপত্রও বলেছে, ভারতীয় সংসদ গণতন্ত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে।

কী করেছে সরকার পক্ষ বিজেপি? সংসদে অনেকগুলি বিল পাস করিয়েছে, যেগুলো নিয়ে কোনও আলোচনা, তর্ক বিতর্ক কিছুই করতে দেওয়া হয়নি। অথচ, তর্ক বিতর্ক, আলাপ আলোচনা হল গণতন্ত্রের প্রাণ। নিতান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, বিরোধী সদস্যদের আলোচনার দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কৌশলে আইন পাস করিয়ে দেওয়ার যে ঘৃণ্য নজির রচিত হল তা গণতন্ত্রের পক্ষে বড় বিপদ।

বিরোধী পক্ষের ভূমিকা কী? তাঁরাও সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়ে ওই সব আইন তৈরির পিছনে সরকার পক্ষের ষড়যন্ত্র উদঘাটিত করে কোনও বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেননি। শুধুমাত্র হৈ হট্টগোল করেই সময় পার করে দিয়েছেন। দিনের পর দিন অধিবেশন ভণ্ডুল করে দিয়েছেন, যা শাসক দলকে কৌশলে বিল পাশেরই সুযোগ করে দিয়েছে।

শুধু এবারই প্রথম নয়, নরেন্দ্র মোদির সাত বছরের শাসনে বহুবার সংসদে বিতর্ক ছাড়াই বিল পাশ করানো হয়েছে। বিরোধীদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়াই প্রধানমন্ত্রী মোদির বরাবরের বৈশিষ্ট্য। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন না, তাদের প্রশ্ন শোনেন না, উত্তর দেওয়ার তো বালাই-ই নেই। যে সংসদকে একদিন গণতন্ত্রের মন্দির বলে মাথা ঠুকেছিলেন সেই সংসদেও একই ভূমিকা। গণতন্ত্রকে মূল্য দিয়ে তিনি বিতর্ককে স্বাগত জানান না। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কখনও বিতর্ক হলে তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। সরকার পক্ষের প্রধান হিসেবে জবাবি ভাষণ দেন না। কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া বা প্রসঙ্গ এড়িয়ে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া— এভাবেই তিনি সংসদে আচরণ করছেন এবং সংসদের গুরুত্বকে খাটো করছেন। শুধু তাই নয়, প্রশ্ন অপ্রিয় হলে তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে দাগিয়ে দিতেও অতি পারদর্শী। বিরোধীরা বহুবার দাবি করলেও কৃষি বিল নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেননি। সাম্প্রতিক কালে বহু আলোচিত ফোনে আড়িপাতার পেগাসাস কাণ্ডকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার বিষয়ে বিতর্কও উপেক্ষা করেছেন তিনি।

বির্তক এড়িয়ে বিল পাশের নজির বিজেপি শাসনে ব্যাপক রূপ নিলেও, কংগ্রেস শাসনেও এ জিনিস দেখা গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক বাহক সব দলই কম-বেশি এই অগণতান্ত্রিক ধারা বহন করছে। কেন সংসদের মতো একটা উচ্চতম প্রতিষ্ঠানে এভাবে গণতন্ত্র খর্ব হচ্ছে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শুরুর দিকে সংসদে যতটুকু গণতন্ত্রের চর্চা হত কেন তার বিলুপ্তি ঘটছে? এর কারণ হল পুঁজির কেন্দ্রীকরণ। পুঁজি যত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, একচেটিয়া রূপ নিচ্ছে, তত তার আধিপত্যবাদী ক্ষমতা বাড়ছে, তত সে আগ্রাসী হচ্ছে, তত সে সমালোচনা গণতান্ত্রিক বিতর্ককে পদদলিত করছে, তত সে বিতর্কের প্রতিষ্ঠান সংসদকেও ঠুঁটো করে রাখছে। অর্থনীতিতে মনোপলি বা একচেটিয়া রূপ এলে তার উপরকাঠামো হিসাবে রাজনীতিতেও একদলীয় আধিপত্য কায়েম হয়, বিপন্ন হয় বহুদলীয় গণতন্ত্র। পার্লামেন্ট একচেটিয়া পুঁজির দাসত্ব করে ও প্রশাসন হয়ে ওঠে ফ্যাসিস্টিক। পুঁজিবাদ বিকাশের পথে একচেটিয়া রূপ নেয়, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে, অন্য দেশকে পদানত করে, নিজ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও হরণ করে, প্রয়োজন হলে সংসদকে রবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহার করে। সেটাই নগ্ন রূপে ঘটল এবার সংসদের বাদল অধিবেশনে।

সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে সভা

'স্বাধীনতার ৭৫ বছরে মানবাধিকার' শীর্ষক আলোচনার আয়োজন করে সিপিডিআরএস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। ২২ আগস্ট কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত সভায় (ছবি) বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, ডাঃ অংশুমান মিত্র, সংগঠনের সহ সম্পাদক রাজকুমার বসাক। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক সৌম্য সেন। অনুষ্ঠানটি অনলাইনেও সম্প্রচারিত হয়।

২১ আগস্ট বাঁকুড়ার মাচানতলায় সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে নাগরিক সভা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ সজল বিশ্বাস, সঞ্চালনা করেন আইনজীবী হরিদাস ব্যানার্জী।

২১ আগস্ট বিশ্বভারতী সংহতি দিবস রাজ্য জুড়ে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হয়। ছবিতে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ছাত্রছাত্রীদের সংহতি জ্ঞাপন।

'ছাত্র সংকল্প দিবস' পালিত

১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম শহিদ দিবসকে 'ছাত্র সংকল্প দিবস' হিসাবে দেশ জুড়ে পালন করে এআইডিএসও। সংগঠনের উদ্যোগে ছত্তিশগড় রাজ্যের দুরগ (ছবি), বিলাসপুর, রায়পুর সহ নানা স্থানে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। ওই দিন ক্ষুদিরামের ছবিতে মাল্যদান, আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়।

৩৭০ ধারা বাতিলের দু'বছর জম্মু-কাশ্মীর স্বাভাবিক হল কই!

৫ আগস্ট, পেরিয়ে গেল কাশ্মীরের মানুষের কাছ থেকে ৩৭০ ধারার অধিকার কেড়ে নেওয়ার দু'বছর। সেদিন সকাল থেকেই শ্রীনগরের রাস্তা শুনশান, দোকান বাজার বন্ধ, ঐতিহাসিক ডাল লেকে হাউসবোট বা শিকারা চলেনি। সাধারণ মানুষ নিজেরা স্বেচ্ছায় থাকলেন ঘরবন্দি। গোটা উপত্যকা জুড়েই অদ্ভুত নীরবতা। এ যেন এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট হঠাৎ একতরফা কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার কেড়ে নেওয়ার ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাকে দু'ভাগ করে কাশ্মীর ও লাদাখ দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করেছিল তারা। ৩৫-এ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরিদের জমির মালিকানা সংক্রান্ত এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে চাকরি ও অন্যান্য যে অধিকার তারা ভোগ করতেন তা কেড়ে নিয়েছিল। বলেছিল, এই পথেই নাকি কাশ্মীর সমস্যার সমাধান তারা করে ফেলবে। আর সেদিনই এস ইউ সি আই (সি) বলেছিল, '... যখন দরকার ছিল ৩৭০ ধারার সম্পূর্ণ রূপায়ণ করে কাশ্মীরি জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা এবং পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও পরাস্ত করা, তখন একতরফা ৩৭০ ধারা বাতিলের দ্বারা কাশ্মীরের জনগণকে আরও বিচ্ছিন্ন করে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে বাড়তে সাহায্য করবে। সামরিক বাহিনী দিয়ে প্রতিবাদী কণ্ঠকে কিছুকালের জন্য নীরব করে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা বৈরিতা বাড়তেই সাহায্য করবে।'

কী দেখা গেল দু'বছর পর? সারা দেশ দেখল কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বেচ্ছাচার এবং গায়ের জোর হিসাবেই মনে করে কাশ্মীরের জনগণ। তাই শ্রীনগর সহ অনন্তনাগ, বাদগাম, গাণ্ডেরবাল, কুপওয়ারা ও অন্যান্য জায়গায় সেদিন পালিত হল অঘোষিত স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। অধিকাংশ দোকান বাজার বন্ধ রইল, স্তব্ধ হল বেশিরভাগ যানবাহন। যে কয়টি দোকান খোলা ছিল, যানবাহন চলেছিল, তা পুলিশের চাপে, নিতান্ত বাধ্য হয়েই। এই হরতাল কোনও সংগঠন এমনকি বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও ডাকেনি, কিন্তু কাশ্মীরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপিয়ে দেওয়া ফরমানের বিরুদ্ধে তাদের বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন এভাবেই।

অথচ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দাবি করেছিল, ৩৭০ ধারা বাতিল করলেই কাশ্মীর ভারতের মূল স্রোতে আসবে। আরও বলেছিল, এর ফলে জম্মু-কাশ্মীরে প্রচুর আর্থিক বিনিয়োগ হবে এবং দু'বছরের মধ্যেই অন্তত ৫০ হাজার যুবকের কাজ হবে, কাশ্মীরি নারীরা তাদের অধিকার ফিরে পাবে, জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ হবে, পরিবেশ স্বাভাবিক হবে, উন্নয়নের বন্যা বইবে। কিন্তু বাস্তব বলছে ঠিক উল্টো কথা। বিপুল আর্থিক বিনিয়োগ দূরের কথা, ছিটেফোঁটা বিনিয়োগও কাশ্মীর, লাদাখ এমনকি জম্মুতেও আসেনি। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনও বিনিয়োগ আসতে পারে না। তাই কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়নি।

করোনা অতিমারির কারণে দেশে লকডাউন ঘোষণার বহু আগে থেকেই লকডাউন চলছিল জম্মু-কাশ্মীরে। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় ইন্টারনেট যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিক্ষা কার্যত শিকেয় উঠেছে। পর্যটন ব্যবসার পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। ফলে কাজ পাওয়া দূরের কথা, অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় লাগাম পরানো হয়েছে। যে সব সাংবাদিক সত্য প্রচারের সাহস দেখাতেন, তাদের অধিকাংশকেই রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। বেশ কিছু দৈনিক সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম সরকারি হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাংবাদিক সুজাত বুখারি গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। নাগরিক অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছে। বিরোধী দলগুলোর নেতারা দীর্ঘদিন গৃহবন্দি হয়ে থাকার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মুক্তি এবং বৈঠকের নাটক করলেন। সরকার বলল, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাদের স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে দিচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর স্বাভাবিক হয়নি।

এক বছর আগেও, কিছু সংবাদমাধ্যম যখন সচল ছিল, তারা দেখিয়েছে কী ভাবে সরকারি জমিতে নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে, যাতে আগামী দিনে ওই সমস্ত খালি জায়গা বাইরের রাজ্যের কর্পোরেট মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা কিনে নিতে পারে। রাজ্যের মানুষ এক অজানা আশঙ্কায় ভুগছেন, যে ভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, হাজারে হাজারে বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে, পাথর কেটে সমতল ভূমি তৈরি করা হচ্ছে, তার ফলে আগামী দিনে উত্তরাখণ্ডের মতোই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। স্থানীয় মানুষদের আরও আশঙ্কা, আগামী দিনে কাশ্মীরের জীবনরেখা পর্যটন শিল্পকেও কবজা করে ফেলবে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থা। সাধারণ মানুষ তাদের ব্যবসা ও জীবন-জীবিকা হারিয়ে সাধারণ শ্রমিক মজুরে পরিণত হবেন। সাংবাদিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনযাপন করছেন কাশ্মীরবাসী। তাদের কাশ্মীরি ভাবাবেগ বা কাশ্মীরিয়ৎকে আঘাত করেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, নাগরিক অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে প্রশাসনের উদ্ধত বেয়নেটের সামনে মানুষ চুপ করে থাকলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু ক্ষোভের বারুদ জমছে। এটা যদি কেন্দ্রীয় সরকার না বুঝতে পারে, তাহলে তার পরিণতি কী হবে ভবিষ্যৎই বলবে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলের জোট 'গুপকর'-এর নেতারা গত ৫ আগস্ট জোটের চেয়ারম্যান ডাঃ ফারুক আব্দুল্লাহর বাড়িতে এক সভায় বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। বিগত সরকার যে সব কাজ জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের বিভিন্ন জায়গায় শুরু করেছিল গত দুই বছরে কেন্দ্রীয় সরকার তার কিছুই সম্পন্ন করতে পারেনি, উন্নয়ন দূরের কথা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে বিধানসভা নির্বাচন করতে হবে।'

আজ কাশ্মীরে কান পাতলে শোনা যায়, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়ার আগে জম্মু-কাশ্মীরে কাশ্মীর উপত্যকাই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একমাত্র সমস্যার জায়গা। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে চার। কাশ্মীর উপত্যকার সাথে সমস্যা সঙ্কুল তালিকায় যোগ হয়েছে কারগিল, লাদাখ ও জম্মু। ৩৭০ ধারা বাতিলের পর রাজ্যের পরিস্থিতি দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। সর্বত্র অসন্তোষ বেড়েছে সাধারণ মানুষের। যার অভিব্যক্তি বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কাশ্মীরের এ কথা শোনার মতো সময় সরকারের আছে কি?

তথ্য সূত্র ঃ পিটিআই, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ আগস্ট

প্রকাশিত হচ্ছে

চাষী মজুরের অন্তহীন সংগ্রামের কথা

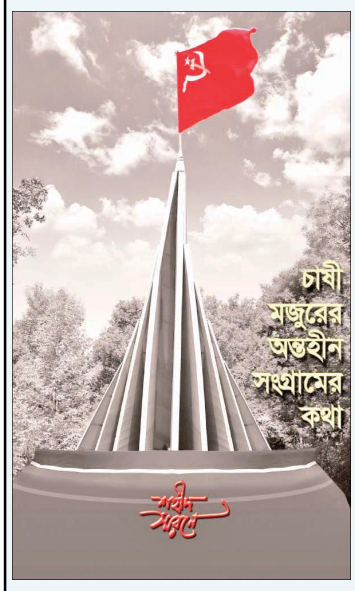

বিষয়সূচী ঃ

- শহীদ স্মরণ সমাবেশে কমরেড রবীন মণ্ডলের বার্তা
- কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর স্মরণসভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ (অপ্রকাশিত)
- কমরেড শচীন ব্যানার্জীর স্মরণসভায় কমরেড নীহার মুখার্জীর ভাষণ
- কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার এক সার্থক সৃষ্টি ইয়াকুব পৈলান ঃ জয়নগরের স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ
- শত শত আমিরালী হালদারের জন্ম হোক— যারা গরিব চাষী-মজুরের বাঁচার লড়াইয়ে নিজেদের উৎসর্গ করবে ঃ স্মরণ সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ
- জয়নগরে যুব সম্মেলনে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ভাষণ
- শহীদদের আত্মোৎসর্গ ভুলিনি—ভুলতে পারি না
- আমাদের শিরায় শিরায় বইছে শহীদের রক্ত

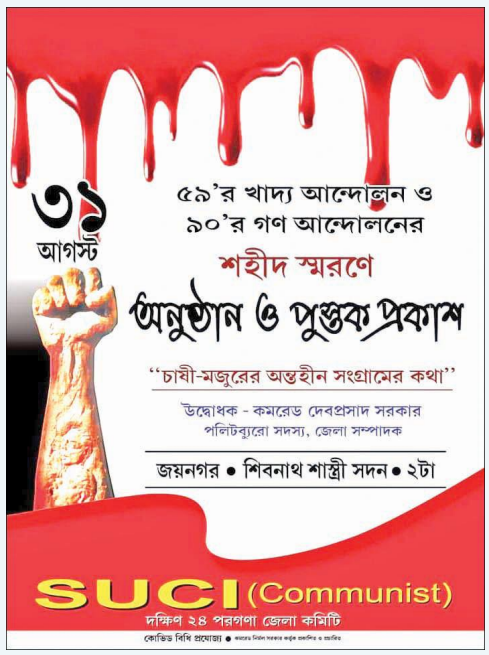

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস স্মরণ

তিনের পাতার পর

"বিশ্বব্যাপী মার্কস এবং এঙ্গেলসের মহান ঐতিহাসিক অবদান নিহিত আছে এইখানে যে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সব দেশের সর্বহারা শ্রেণির ভূমিকা, তাদের কর্তব্য, তাদের আহ্বান জানাতে, পুঁজির বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বাগ্রে দাঁড়াতে এবং সমস্ত মেহনতি ও শোষিত জনগণকে তাদের চারপাশে সংঘবদ্ধ করতে পথ নির্ধারণ করেছিলেন।" (১৯১৮ সালের ৭ নভেম্বর মার্কস-এঙ্গেলসের মূর্তি উন্মোচনকালে লেনিনের বক্তৃতা)।

"তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত রচনাবলিতে মার্কস ও এঙ্গেলস সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে সমাজতন্ত্র কোনও স্বপ্নদর্শীর খেয়ালি পছন্দ নয়, বরং আধুনিক সমাজে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও অপরিহার্য ফল...। আধুনিক সমাজতন্ত্রের উদ্গাতা হিসাবে সঠিকভাবেই মার্কস ও এঙ্গেলসের নাম পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে।" (ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ঃ ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লিখিত)।

এঙ্গেলসের 'ল্যুডভিগ ফুয়েরবাক ও জার্মান চিরায়ত দর্শনের অবসান' এবং 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'— যা প্রতিটি শ্রেণি সচেতন শ্রমিকের কাছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র মতোই সঙ্গে রাখা আবশ্যিক পাঠ্যের মতো রচনা, যেগুলি আয়ত্ত করতে না পারলে মার্কসবাদকে সম্যকভাবে বোঝা ও তুলে ধরা সম্ভব নয়। এখানে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লেনিন স্পষ্টভাবে মার্কস-এঙ্গেলস উভয়কেই ''আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা'' বলে উল্লেখ করেছেন। (চলবে)

পাঠকের মতামত

স্যার, স্কুল খুলবে না?

স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন আমার এক ছাত্রী বলেছিল,কালকে আমিও যাবো স্কুলে। ১৫ আগস্ট সকাল ৮টায় স্কুলে রওনা হবার আগে ভাবছিলাম নিয়ে যাবো কিনা। কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়া যাবে না।

আমাদের স্কুলের এক ছাত্রীর বাড়ি আমার বাড়ির পাশেই। আগে সে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ত। তারপর আমাদের স্কুলে ২০২০তে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়। মাস দুয়েক স্কুল যাওয়ার পর লকডাউন। এখন সে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। আমাদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যে বন্ধ এ কথা বলা যাবে না। বলা ভালো পঠনপাঠন বন্ধ। প্রতি মাসে দু-তিন দিন ধরে মিড ডে মিলের খাদ্যসামগ্রী বাবদ চাল-ডাল-আলু দিতে হয়। অভিভাবকরা এসে নিয়ে যান। পড়ুয়াদের আসা নিষেধ।

আমার বাড়ির পাশের ছাত্রীটি প্রতি মাসেই বায়না ধরে। বায়না ধরে ওকেও যেন একটা দিন স্কুলে নিয়ে যাই। আমি নির্মম হয়ে বলি, না, নিয়ে যাওয়া যাবে না। একদিন ওর কথা শুনে নিজেই আঁতকে উঠি। 'ও জী, আমাকেও স্কুলে নিয়ে যা না। আমার স্কুলের বন্ধুদের অনেকদিন দেখিনি।'

আমাকে 'জী 'বলেই ডাকে ছাত্রীটি। আমি ওর কথা শুনে একটা কষ্টমাখা হাসি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিনি। বিগত প্রায় ১৮ মাস ধরে রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ। মাঝে শুধু অল্প কিছুদিন নবম-দ্বাদশের ক্লাস হয়েছে। কেমন আছে শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণ পড়ুয়ারা? একদম ভালো নেই। কেউ ভালো নেই। ছোট্ট ছোট্ট মনগুলোর ভেতরে বাসা বেধেছে অবসাদ। পড়াশোনা থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন। হ্যাঁ, কিছু বেসরকারি বিদ্যালয়ে অনলাইনে পড়াশোনা চলছে। কিন্তু সেটাও তো ক্লাসরুম শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। সাময়িক জরুরি পরিষেবা হতে পারে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়।

একটা বড় অংশের পড়ুয়াদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ বিদ্যালয়কেন্দ্রিক। বাড়িতে পড়িয়ে দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। থাকলেও সংসার চালাতে সন্তানকে নিয়ে সকাল সন্ধ্যা বসা হয় না। পড়িয়ে দেওয়া হয় না।

কিছু সংখ্যক পড়ুয়া গৃহ শিক্ষকের কাছে শিখছে। কিন্তু স্কুল নেই, পড়া নেই, বাড়ির কাজ নেই, পরীক্ষা নেই। পড়ার আগ্রহটাই হারিয়ে ফেলছে এই গৃহশিক্ষকদের কাছে পড়া পড়ুয়ারাও।

ছাত্রছাত্রীদের বাবা মা হাটে বাজারে ঘুরছে। মিটিং মিছিল জনজোয়ারে ভাসছে। স্কুল বন্ধ রাখলেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদ এই কথাটা ঠান্ডা ঘরেকোন বিশেষজ্ঞ ভাবলেন?

অভিভাবকদের সঙ্গে আমার কথা হয়। এমন একজনও নেই যিনি চান না স্কুল খুলুক। ছাত্রছাত্রীরা চায় স্কুল খুলুক। শুধু সরকার চায় না।

অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তুলে ধরার একটা প্রাণপণচেষ্টা চালানো হচ্ছে । যাতে ক্লাসরুম শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই তুলে দিয়ে শিক্ষার দায় ঝেড়ে স্যানিটাইজারে হাত ধুয়ে ফেলতে পারে শাসক শ্রেণি। তাই যত দেরি করা যায় স্কুল খুলতে।

আইসিএমআর, এইমস, ইউনিস্কো, ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো করোনাবিধি মেনে স্কুল খোলার কথা বলেছে। ভারতের কয়েকটি রাজ্য স্কুল খোলার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে? মুখ্যমন্ত্রীর কথায়— পুজোর পর ভাববেন। মানুষ মুখ খুলছে। অভিভাবকরা হাটে বাজারে, চায়ের দোকানের আলোচনায় স্কুল খোলার কথা বলছে। ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে। একটি ছাত্র সংগঠন স্কুল খোলার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়ে কারাবরণও করেছে। শিক্ষকদের সংগঠনও আন্দোলন করছে ।

আমার এক ছাত্রের দেখা রাস্তায়। সে জানতে চাইলো, ও স্যার স্কুল খুলবে না?

বললাম, জানা নেই রে।

সে বলল, 'দুয়ারে সরকার' যে হচ্ছে! ওখানে করোনা নাই ? এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? পানশালা খোলা, পাঠশালা বন্ধ। দ্রুত খুলুক পাঠশালা।

আব্দুল জলিল সরকার
শিক্ষক, হলদিবাড়ি, কোচবিহার

স্কুল খোলার দাবিতে পথে শিক্ষকরা

করোনার অজুহাতে স্কুল বন্ধ রাখার নীতি শিক্ষার অপরিমেয় ক্ষতি করছে। এ ক্ষতি আর দীর্ঘায়িত করা চলে না। তাই অবিলম্বে স্কুল খুলতে হবে, এই দাবিতে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ৬-১২ আগস্ট রাজ্যব্যাপী 'দাবি সপ্তাহ' পালন করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দুর্গা পুজোর পর স্কুল খুলবেন। সমিতির দাবি, এখনই খুলতে হবে। এই দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, কমিশনার, জেলাশাসক, ডি আই, চেয়ারম্যান, সার্কেলের এস আই প্রমুখ পদাধিকারীদের কাছে নানা জেলায় দাবিপত্র পেশ করা হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হান্ডা বলেন, রাষ্ট্রসংঘ, হু, ইউনেসকো, আমেরিকার বিজ্ঞান পত্রিকা 'ল্যানসেট', লোকসভার সংসদীয় কমিটি, আইসিএমআর, এইমসের মতো আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের বহু সংস্থা স্কুল চালু করার সুপারিশ করেছে।

সংস্থাগুলি আরও জানিয়েছে, দীর্ঘ করোনা কালে গৃহবন্দি প্রতিটি শিশুই মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হয়েছে, তা দূর করতেও দ্রুত স্কুল চালু করতে হবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, প্রতিবেশী বাংলাদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন হরিয়ানা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, কর্ণাটক, ছত্তিশগড়, দিল্লি, বিহার ওড়িশায় স্কুলে পঠন পাঠন চালু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে থাকবে কেন?

পুলিশি হেফাজতে দৈনিক ৫টি মৃত্যু
৭৫ বছরে গণতান্ত্রিক ভারত!

বিশ্বে গণতন্ত্র রক্ষার চ্যাম্পিয়ান আমেরিকায় পুলিশের বুটের তলায় পিষ্ট জর্জ ফ্লয়েডের কথা মনে পড়ে? শ্বাসরুদ্ধ ফ্লয়েড বলেছিলেন, আই কান্ট ব্রিদ। তেমনই শ্বাসরুদ্ধ আজ ভারতের ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক পরিসরও। তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে এক মোবাইল দোকানি ও তাঁর ছেলেকে পিটিয়ে মেরেছে পুলিশ। পুলিশি হেফাজতেই শ্বাস বন্ধ হয়েছে অশীতিপর সমাজকর্মী স্ট্যানস্বামীর। হাথরসে দলিত মেয়ের খুনি-ধর্ষকরা পুলিশের সহায়তাই পেয়েছে, আর নির্যাতিতার দেহ গোপনে পুড়িয়েছে পুলিশ। অবশ্য উত্তরপ্রদেশে বসে মহিলাদের, দলিতদের, সংখ্যালঘুদের শ্বাস নেওয়ার উপায়টাই ক্রমাগত কমিয়ে আনছে শাসকরা। তুতিকোরিনের দোকানদার চেয়েছিলেন লকডাউনের মধ্যেও সামান্য রোজগার করতে। সমাজকর্মী চেয়েছিলেন অত্যাচারিত দলিতরা মাথা উঁচু করে বাঁচুক। হাথরস-কন্যা চেয়েছিল শুধুই মানুষ হিসাবে বাঁচতে। এই চাওয়াগুলিই শাসকের চোখে 'অপরাধ'। চাই জীবন দিয়ে তার চড়া মাশুল দিতে হল এঁদেরকে।

স্বাধীনতার ৭৫ বছরে গণতান্ত্রিক ভারতের কী অপার মহিমা! পুলিশি হেফাজতে দেশে দিনে গড়ে ৫টি মৃত্যু ঘটে— ন্যাশনাল ক্যাম্পেন এগেনস্ট টর্চার নামক একটি সংস্থা সমীক্ষা করে দেখিয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এনএইচআরসি-র ২০২০-র মার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, পুলিশি হেফাজত ও জেল হেফাজতে নথিভুক্ত মৃত্যুর সংখ্যা ১৭ হাজার ১৪৬। শারীরিক হেনস্থা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাও থানায় ঘটছে বেশি। পুলিশ তবে কার রক্ষক?

১৯৬১ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এ এন মুল্লা বলেছিলেন, 'পুলিশ হল সুসংগঠিত ক্রিমিনাল বাহিনী।' তিনি বলেন, 'দেশে এমন কোনও বেআইনি সংগঠন নেই যাদের অপরাধজনিত রেকর্ড সংগঠিত পুলিশ বিভাগের অপরাধের থেকে বেশি।' স্বাধীনতার ১৫ বছর পার হওয়ার আগেই ভারতের বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বরূপটি দেখিয়ে দিয়েছিল এই উক্তি। প্রশাসন গত ৬০ বছরে আরও নির্মম হয়েছে। স্বাধীনতার পর নতুন ভারতের স্বপ্ন যখন জনমানসে টাটকা— সে সময় বিচারবিভাগেও পড়েছে তার কিছু কিছু ছাপ। তাই ভারতের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল এম সি শীতলবাদ সে সময় বলেছিলেন, 'বিচারপ্রক্রিয়ার বাইরে রাখা উচিত পুলিশকে।' অথচ দিনে দিনে পুলিশই যেন বিচারকর্তা হয়ে উঠেছে। পুলিশ বিচার হওয়ার আগেই চরম শাস্তি দিচ্ছে, নিরপরাধ নাগরিকের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছে পুলিশের মাত্রাছাড়া নির্যাতন। সংবিধানের ২১নং ধারায় ব্যক্তির অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা যাই লেখা থাক, বইয়ের বাইরে তার কোনও অস্তিত্ব আজ ভারতে নেই। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার এনকাউন্টারে মৃত্যুকেই আইনের কাঠামো দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সরকারি হিসাবে শুধু উত্তরপ্রদেশেই গত সাড়ে চার বছরে বিজেপি শাসনে ৮৪৭২টি এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেছে। এতে পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে ৩৩০২ জন, মারা গিয়েছে ১৪৬ জন। সে রাজ্যে গণআন্দোলন করতে গিয়ে বহু রাজনৈতিক বন্দিকে জেল হেফাজতে নৃশংস শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে যত সরকার এসেছে, পুলিশ-প্রশাসনকে মুঠোয় পুরে সাধারণ মানুষের উপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। বর্তমানে চরম স্বৈরাচারী বিজেপি সরকার তাদের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে যে কোনও প্রতিবাদী স্বরকে কঠোর হাতে দমন করতে নেমে পড়েছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে বিজেপি মন্ত্রীর বয়ানে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী গত সপ্তাহে সংসদে বলেছেন, ২০১৭-২০১৯-এর মধ্যে ১১৮৯ জন পুলিশি হেফাজতে অত্যাচারিত হয়েছেন এবং পুলিশের সাথে ভুয়ো সংঘর্ষে ৩৪৮ জন মারা গেছেন। যদিও সরকারি এই হিসেব যে আসল সংখ্যার তুলনায় কিছুই নয় তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। পুলিশি হেফাজতে বহু মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্তও হয় না। লকআপের বাইরে এই ধরনের মৃত্যুর ঘটনা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তা সত্ত্বেও এনএইচআরসি-র ২০১৯ এর রিপোর্টের ভয়াবহতায় মানুষ আতঙ্কিত— ১৭২৩ জন জেল এবং পুলিশি হেফাজতে মারা গেছেন। বিচার ব্যবস্থাকে এড়িয়ে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনই বিচারের ভার তুলে নিলে তাকে সভ্য দুনিয়া ফ্যাসিস্ট শাসনই বলে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ গণতন্ত্রের বদলে বেশি করে দমনতন্ত্রের দিকেই ঝুঁকে। তাই আমলা-প্রশাসন-পুলিশের পদতলে পিষ্ট বিচারব্যবস্থা প্রশাসনের দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে। অবাধ্য হলে, সরকারের ও ক্ষমতাবানদের হুকুম না শুনলে বিচারকও খুন হয়ে যাচ্ছেন। তাই সাধারণ মানুষের আইনি অধিকার সুরক্ষা নিতান্তই কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যত একচেটিয়া রূপ নিচ্ছে, উপরিকাঠামো হিসাবে প্রশাসনিক স্তরে ফ্যাসিবাদী প্রবণতাও মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। সরকার ক্রমশ বেশি করে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে, পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করছে।

পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদের এই ভয়াবহ আক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে দরকার সঠিক সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষের উত্তাল আন্দোলন।

ফি বছর বন্যা কি অনিবার্য?

এ রাজ্যে প্রায় প্রতি বছর বন্যায় জনজীবনের চরম দুর্দশা, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি যেন অনিবার্য বিপর্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন এর কোনও প্রতিকার নেই। এমনকি দুর্গত মানুষদেরও কেউ কেউ মনে করেন, প্রকৃতির মার কি আটকানো সম্ভব! ফলে সরকারগুলি মাঝে মধ্যে কোনও রকমে কিছু বাঁধ বানিয়ে অথবা ভাঙা বাঁধে একটু মাটি ফেলে আর যৎসামান্য ত্রাণ বিলি করেই দায় সারে এবং এসব করতে গিয়ে শাসকদলের মদতপুষ্ট ক্ষমতাশালীরা নানা দুর্নীতি করে আখের গোছায়। বছরের পর বছর ধরে এই চলছে। মানুষ মাঝে মাঝে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, আবার কিছু দিন পরে স্তিমিত হয়ে যায়। বিপদে বুক পেতে তারা বাঁধ আগলানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেও রাষ্ট্রের টনক নড়ে না। অথচ এই মানুষেরাই নানা ভাবে শ্রম দিয়ে সভ্যতাকে সচল রাখে। বিনিময়ে তারা হয়তো বা একটু ত্রাণ পায় কিন্তু পরিত্রাণ পায় না।

দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে ৭৫ বছর। তবুও বন্যার ধ্বংসকাণ্ড থেকে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষার কাজ বহুলাংশেই অধরা থেকে গেলকেন? এর উত্তর একটাই, সাধারণ মানুষের প্রতি ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অনন্ত অবজ্ঞা আর অসীম উদাসীনতা।

যেমন, দক্ষিণবঙ্গ। এখানে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সমুদ্রের জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে বহু জনপদ। সরকারি হিসাবেই বাঁধ ভেঙেছে ২৮ কিলোমিটার। ৭৬ কিলোমিটার নদীবাঁধের ক্ষতি হয়েছে। সুন্দরবনের নদী বাঁধের ভাঙন আটকানো যায়নি। ৭১টি স্থানে সেই নদী বাঁধ ভেঙেছে। আয়লার সময় ১৭৭ কিলোমিটার বাঁধ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে ৭৭৮ কিলোমিটার বাঁধে আংশিক ক্ষতি হয়েছিল। এই সমস্ত বাঁধ পুনর্নির্মাণ কবে হবে বা আদৌ স্থায়ী বাঁধ তৈরি করা হবে কিনা তা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন। এই সব জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করতে গেলে, হয় হাতিবাঁধ যা ৫.৮ মিটার উঁচু বা সমুদ্রবাঁধ যা ৭.২ মিটার উঁচু করতে হবে। ৪০ মিটার ভিতের এই বাঁধ আটকাতে পারবে জোয়ারের জল। এছাড়া নদীর দিকে বাঁধের সামনে ম্যানগ্রোভ আর জমির দিকে সুন্দরী গাছ বসাতে হবে। কিন্তু এই সব কাজ হবে কবে? গড়িমসি, অবজ্ঞা, অবহেলা চলছেই। দপ্তরে দপ্তরে ঠেলাঠেলি, কেন্দ্র-রাজ্য চাপানউতোর চলছে। বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

উত্তরবঙ্গে বন্যার তাণ্ডব থেকে বাঁচার অন্যতম পথ, বিশেষজ্ঞদের মতে, নদীগুলোর উপরের অববাহিকাতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা। এছাড়া, যে বহু ছোট ছোট শাখানদীগুলোকে নানা কারণে প্রায় মেরে ফেলা হয়েছে সেগুলোকে সংস্কার করে দ্রুত জলনিকাশি স্বাভাবিক পথ তৈরি করে দেওয়া। যেমন, ১৯৫৯ সালে জলঙ্গি-করিমপুর রোড তৈরির সময়ে সরকারি উদ্যোগে জলঙ্গি নদী বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর অনেকেই নদীর বুকে মাটি ফেলে আবাদী জমি বাড়িয়ে নিয়েছেন। সংবাদে প্রকাশ, তেহট্টের এক ঘাট মালিক জানিয়েছেন, প্রতি শীতে তিনি ৭০ থেকে ৮০ লরি মাটি ফেলে নদীর দু'পাড়কে কাছে আনেন। তারপর নদীর বুকে খান চারেক নৌকো বেঁধে তার উপর তক্তা ফেলে গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করেন। এর বাইরে আছে মৎস্য সমবায়গুলি। যারা লিজের নামে নদী যেন কিনেই ফেলেছে এমন মেজাজে নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে ব্যবসা করছে। এ সবই চলে শাসকদলের প্রশ্রয়ে। শাসকদলের নেতারা কাটমানি নেয় আর হাজার হাজার মানুষের জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে।

এর পর আছে ডিভিসি নামক জুজু। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নদী বিশেষজ্ঞরা বহু প্রশ্ন তুলেছিলেন যা আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু রাষ্ট্রের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাই এই প্রকল্পের কোনও সংস্কারও নেই। ডিভিসির ছাড়া জলে বন্যা লেগেই থাকে। এখনও সেই বিপর্যয় চলছে। ডিভিসির এক কর্মকর্তা লিখেছেন, 'আমেরিকার 'টেনেসি ভ্যালি প্রকল্প'-এর অনুসরণে পরিকল্পিত এই প্রকল্প রূপায়ণের ভার দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার ডবলিউ এল ভরদুইন-এর উপর। ...ভরদুইনের নকশা অনুযায়ী মূল প্রস্তাবে ৭টি স্টোরেজ ড্যাম ও একটা ডাইভারশন ড্যাম তৈরি করার প্রস্তাব ছিল। ...চারটি ড্যাম তৈরি হল। এর পরেই শুরু হল বাংলা-বিহার বিতর্ক। বন্ধ হয়ে গেল কেন্দ্র থেকে অর্থ বরাদ্দ। চারটি বাঁধ আর তৈরি হল না। ভরদুইনের প্রস্তাবের এক-তৃতিয়াংশ রূপায়িত হল। ওই কর্মকর্তা আরও লিখেছেন, 'যে চারটি বাঁধ তৈরি হল, দেখা গেল তাতে ১০.৪৩ লক্ষ একর ফুট জল নিয়ন্ত্রণ এবং ৯.৭৫ লক্ষ একর ফুট সেচের জল 'লাইভ স্টোরেজ' করে রাখা সম্ভব। ১৯৫৯ সালের এই তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, জল ধরে রাখতে না-পারার ক্ষমতা অর্থাৎ ডিভিসির এই বিকলাঙ্গতা তার জন্মসূত্রেই পাওয়া।' ২০০০ সালে প্রবল বন্যার সময় বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছিলেন, ডিভিসি-র জলাধারগুলোর ধারণ-ক্ষমতা কিছুটা বাড়াতে হলেও বছরে শীতের সময় অন্তত একটির পলি তুলে ফেলা দরকার। প্রয়োজনে কোনও দূরবর্তী স্থানে জল সরিয়ে রেখে এটা ধাপে ধাপে করা দরকার। যদিও গত বিশ বছরে তেমন কোনও উদ্যোগ হয়নি।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের ঘটনা আরও ভয়াবহ। এক সমাজকর্মীর ভাষায়, 'ফি বছর ঘাটাল মহকুমায় নিয়ম করে বন্যা হয়। বানভাসি হয় ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ১ ও ২ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। নিঃস্ব হন বহু মানুষ। প্রশাসন থেকে শাসকদলগুলি আশ্বাস দেয়, পরের বার ঠিক সমাধান হয়ে যাবে। বছরের পর বছর আসে, কিন্তু সেই আশ্বাস ভেসে যায় বন্যার জলের তোড়ে। তিনি দেখিয়েছেন, '...জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রিসভা ১৯৫৯ সালে ঘাটাল-সহ সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য অর্থনীতিবিদ মান সিংহের নেতৃত্বে কমিটি তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই কমিটি রিপোর্ট পেশ করতেই পেরিয়ে যায় ২০ বছর। ১৯৭৯ সালে ওই কমিটির পেশ করা রিপোর্টের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন পায় 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'। ১৯৮২ সালে ঘাটাল শহরের শিলাবতী নদীর ধারে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের সূচনা হয়েছিল। তখন প্রকল্পের খরচ ধরা হয় ৫০ কোটি টাকা। প্রাথমিক ভাবে ৩০ লক্ষ টাকা অনুমোদনও হয়। ১১৮ কিলোমিটার নদী বাঁধ নির্মাণ-সহ নানা কাজ ওই প্রকল্পে ছিল। ঘাটাল শহরের পূর্ব পারে শিলাবতীর ধারে রুপোর কোদাল দিয়ে তৎকালীন বাম সরকারের সেচমন্ত্রী প্রভাস রায় সেই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। কিন্তু কাজ শুরুর কিছু দিন পরেই প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একাধিক বার এই প্রকল্প অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

এসব ঘটনা জনস্বার্থের প্রতি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবহেলাকেই প্রমাণ করে। বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের নানা পরামর্শ তারা কার্যত ডাস্টবিনে ফেলে দেন। প্রাকৃতিক উপায়ে নদী এবং নদীবাঁধের ভাঙন ঠেকাতে গবেষকরা জানিয়েছেন, নদীর পাড় বা বাঁধের ক্ষয় রোধে কাশ, কুশ, সর, ইরাগ্রস্ট্রস, সায়ানইডিস ইত্যাদি প্রজাতির গাছ নদীর পাড়ে লাগালে সেগুলি নদীর পাড়কে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে রাখে। গাছগুলি লম্বায় সাধারণত দশ-বারো ফুট হলেও মাটির নীচে চলে যায় প্রায় ২০-২৫ ফুট। ফলে ওই শেকড় মাটির অভ্যন্তরকে যেমন আঁকড়ে ধরে রাখে তেমনি মাটির উপরিভাগকেও দৃঢ় করে। এসবের প্রয়োগেও দেখা যাচ্ছে একই অবহেলা। অবাধে বালি চুরি চলে শাসকদলের মদতে। ফলে, এই ধরনের প্রয়োগে আসে নানা প্রতিবন্ধকতা।

প্রযুক্তিগর্বোদ্ধত এই একুশ শতকে গ্রামের মানুষকে জীবন বাজি রেখে বুক দিয়ে বাঁধ আগলাতে হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে মার্কিন সাহিত্যিকের লেখা হল্যান্ডের (এখন নেদারল্যান্ডস) কল্পচরিত্র হান্সের কথা মনে পড়ছে আমাদের। মজার ব্যাপার হল, হান্সের বীরত্বকে মর্যাদা দিয়ে হল্যান্ড শুধু হান্সের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেনি, বন্যা প্রতিরোধে বিশ্বে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছে। যে হল্যান্ডের এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্রসীমার নিচে এবং দুই-তৃতীয়াংশ বন্যাপ্রবণ সেই দেশ আজ বন্যা প্রতিরোধে বিশ্বের পথপ্রদর্শকের স্তরে উন্নীত।

আমাদের দেশের মন্ত্রীরা সে দেশে গিয়ে নানা বাণিজ্যিক চুক্তি করেন কিন্তু বন্যা প্রতিরোধে তাদের পারদর্শিতা নিশ্চিন্তে এড়িয়ে যান। ভারতে ঝড়-বন্যার প্রকোপ থেকে জনজীবনকে রক্ষা করতে কোনও স্থায়ী কর্মসূচির দিকে রাষ্ট্র যাচ্ছে না। মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু করে একেবারে ভাগীরথীর মোহনা পর্যন্ত গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথীর ভাঙন এক মারাত্মক সমস্যা। এই সমস্যা যে হতে পারে, তা বহু আগেই চিহ্নিত করেছিলেন নদী-বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য সহ অনেকেই। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ত্রুটি নিয়েও তাঁরা সরব হয়েছিলেন। ভাঙন, বন্যা, খরা একই সমস্যার এ পিঠ-ও পিঠ বলেও কিছু বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন। এই সমস্যা সমাধানে একদিকে নদীর উচ্চগতিতে জল ধরে রাখার জন্য জোড়বাঁধ, পুকুর খনন, ছোট জলাশয় তৈরি ইত্যাদি নানা পদ্ধতির কথা বারবার সরকারকে তাঁরা বলেছেন। মধ্য এবং নিম্নগতিতে বাঁধের সঠিক ঢাল তৈরি করা যাতে স্রোতের গতিমুখ বাধা না পায়, আবার বাঁধও না ভাঙে— তা নিশ্চিত করার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা আজ মানুষের জানা। নদীকে পলিমুক্ত রাখার জন্য ভূমিক্ষয় রোধ এবং নিয়মিত ড্রেজিং ইত্যাদি নানা পরামর্শ সরকারকে যেমন বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন, তেমনি 'খরা-বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'ও বারবার একই সুপারিশ করেছে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের কোনও সরকারই তা শোনেনি। পরিবেশবিদ, প্রযুক্তিবিদ, নদী বিজ্ঞানী, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদদের যুক্ত কমিটির পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথেই আছে সমাধান, অবশ্যই তা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত হতে হবে।

আমাদের মতো বন্যাপ্রবণ দেশে কেন সরকারগুলো তেমন কোনও কার্যকরী উদ্যোগ নেয় না, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। এমনকি, বন্যার সময় অস্থায়ী যে ন্যূনতম পূর্ব পরিকল্পনা যেমন— ক) জলবন্দি মানুষের বাসস্থানের সুবিধা প্রদানের জন্য বন্যাকবলিত এলাকায় পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা, খ) বন্যাকবলিত মানুষদের পর্যাপ্ত খাদ্য-পানীয় বিশেষ করে শিশুদের খাদ্য, গবাদিপশুর খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধি ও তা সক্রিয় রাখা, গ) বন্যার জল নেমে গেলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে প্রয়োজনীয় ওষুধসহ প্রস্তুত রাখা, ঘ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ঙ) বন্যার পর ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদের বিনামূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক দেওয়া, জমি থেকে বালি অপসারণ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সরকারকে আশানুরূপ পাওয়া যায় না।

এত বড় অন্যায় আর চলতে দেওয়া যায় না। অতীতের স্তিমিত আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। ইতিমধ্যেই ইয়াস পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে 'সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি' ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেছে। এই ধরনের আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। কেন না, ইতিহাসের শিক্ষা, জনস্বার্থকে কাঙ্খিত অগ্রাধিকার এবং যথোচিত মর্যাদা দিতে পারে গণআন্দোলনই।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে মধ্যপ্রদেশে মিছিল

সংযুক্ত কিসান মোর্চার আহ্বানে ৯ আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৮০ বছর উপলক্ষে অবিলম্বে বিজেপি সরকারের কৃষি নীতি বাতিলের দাবিতে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে মধ্যপ্রদেশের গুনা, ইন্দোর, গোয়ালিয়র (ছবি) সহ নানা জায়গায় কৃষকদের বিক্ষোভ মিছিল, ট্রাক্টর মিছিল, মোটরবাইক মিছিল প্রভৃতি হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

শুধু আইন নয়, বধূহত্যা আটকাতে
দরকার তীব্র সামাজিক আন্দোলন

সংবাদপত্রের পাতা খুললেই প্রতিদিন নারী নির্যাতনের অজস্র ঘটনা চোখে পড়ে। খুন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ সহ এই সব ঘটনা বিবেকবান মানুষকে বিচলিত করে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ৭৫ বছর, অথচ দেশের নারীরা প্রতিদিন অত্যাচারিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অসম্মানিত হয়ে চলেছে।

সম্প্রতি বধূহত্যা সংক্রান্ত একটি মামলায় ২৮ পৃষ্ঠার এক রায়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি রিপোর্টকে তুলে ধরেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। মহিলাদের হত্যা নিয়ে ২০১৮ সালের সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, এ বছর ভারতে যত মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে তার ৪০ থেকে ৫০ শতাংশই পণের জন্য। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, এই ধরনের হত্যা আটকাতে দেশের পণপ্রথা বিরোধী আইনের যথাযথ রূপায়ণ জরুরি। শীর্ষ আদালতের এই বক্তব্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের জঘন্য অপরাধে যারা যুক্ত, প্রায়ই দেখা যায় তারা নানা ভাবে, কখনও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে, কখনও পুলিশকে ঘুষ দিয়ে, কখনও অভিযোগকারীদের ভয় দেখিয়ে বিচারপ্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা যাতে এ ভাবে শাস্তি এড়িয়ে যেতে না পারে বিচার ব্যবস্থার সে ব্যাপারে আরও সজাগ হওয়া জরুরি। কিন্তু তার সাথে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, শুধু আইন করে বা প্রচলিত আইনকে কঠোর করে কোনও কুপ্রথাকে সমাজ থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা যায় না। যদিও পণপ্রথার বিরুদ্ধে যে আইন আছে, তাকে আরও কঠোর করা জরুরি, যাতে কেউ পণ নিতে ভয় পায়। কিন্তু শুধু আইনি ব্যবস্থার সাহায্যে পণপ্রথার মতো সমাজমননের গভীরে শেকড় গেড়ে থাকা একটি কুপ্রথাকে বন্ধ করা যায় কি? আইন থাকা সত্ত্বেও আঠারো বছরের নিচে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেশ জুড়ে আজও ব্যাপক। আইনসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমাজে আজও বিধবা বিবাহ তেমন ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। আজও সমাজে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে বেশিরভাগ পুরুষ নারীদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। নারীকে তার সহকর্মী, সহধর্মী হিসাবে দেখে না, দেখে ভোগের সামগ্রী হিসাবে।

সমাজে মূল্যবোধের যত অবক্ষয় হচ্ছে, গণতান্ত্রিক চেতনার মান যত নিম্নগামী হচ্ছে, ব্যক্তিগত ভোগ-লালসা যত বাড়ছে, পণের দাবি ততই বাড়ছে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া মা-বাবার পক্ষে একটা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত গুণই থাকুক এবং যত উচ্চশিক্ষিত হোক, মূলত পণ-সামগ্রীর মূল্যের বিচারেই বিয়ের বাজারে মেয়েদের মূল্য স্থির হয়। যদি কোনও কারণে দাবি অনুযায়ী সবকিছু মেয়ের পরিবার দিতে সক্ষম না হয় তা হলে অনেক সময় বিয়ে ভেঙে যায় বা মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়িতে দিনের পর দিন অসহনীয় অপমান অত্যাচার সহ্য করতে হয়। আবার যে মা-বাবা নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য পণের অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন, তারাই ছেলের বিয়ের সময় মেয়ের বাবার থেকে জবরদস্তি পণ আদায় করেন।

এই কুপ্রথার প্রতিকারের জন্য দরকার সমাজ অভ্যন্তরে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা, সমান অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতার পর কোনও সরকারই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেনি। পণপ্রথার বিরুদ্ধে একটা তীব্র সুসংগঠিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠলে তা থেকে যে সামাজিক চেতনা গড়ে উঠবে, তাতে বাবা-মা পণ নিয়ে বিয়ে করার জন্য জোর করলে যুবক-যুবতীরা যেমন আত্মগ্লানিতে ভুগবেন, তেমনই তা প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখাবেন।

এক সময় এই আন্দোলন কিছুটা হলেও হয়েছে। যুবকরা পণপ্রথার বিরোধিতা করেছে। তারা অভিভাবকদের অমান্য করে পণ না নিয়ে বিয়ে করেছে। আজও মর্যাদাবোধসম্পন্ন যুবকরা পণ ছাড়াই বিয়ে করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে, নীতি-নৈতিকতা মূল্যবোধের সঙ্কটের কারণে হাত পেতে পণ নিতে অনেক শিক্ষিত পুরুষেরও রুচিতে বাধে না। বাস্তবিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর মানুষ হওয়ার শিক্ষার মধ্যে ফারাক আছে। কোনও না কোনও ভাবে সামাজিক সংগ্রামে অংশ না নিলে দ্বিতীয়টি অর্জন করা যায় না, যেখানে প্রথমটি শুধুই পুঁথিগত বিদ্যা। আবার কোনও কোনও মেয়ে নিজেই বিয়েতে বাবা-মার কাছে টাকা, গয়না, জিনিসপত্র চায়। এই অবস্থায় উন্নত রুচি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে যুবসমাজকে তাতে যুক্ত করতে না পারলে সমাজে পণপ্রথার মতো কুপ্রথাগুলি শুধু আইন করে বন্ধ করা যাবে না।

এই আন্দোলনে সংবেদনশীল সচেতন নারী-পুরুষ উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে। যদিও নারী-জীবনের এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে হলে নারীদেরই বেশি উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে না এলে চলবে না। বাইরে থেকে কেউ নারীদের মুক্তি বা স্বাধীনতা দিতে পারে না, যদি না নারীরা নিজেরা তা চায় ও অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে। তাই এ ব্যাপারে মহিলা সংগঠনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ছাড়া অন্য কোনও সংগঠন নারীদের মধ্যে সচেতনতা জাগানো এবং স্বাধীনতার জন্য যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত পথে তাদের সংগঠিত করে এই সমস্যা সমাধানে গণআন্দোলন গড়ে তোলার কাজটা করছে না।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝাড়গ্রামে মিছিল

২২ আগস্ট ঝাড়গ্রামে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রে আফগানিস্তানের জনতার উপরে তালিবানি আক্রমণের বিরুদ্ধে, স্কুল-কলেজ খোলার দাবিতে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোপণ্য ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে, কালা কৃষি কানুন বাতিলের দাবিতে, দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে শহরের কলেজ মোড় থেকে হাসপাতাল রোড পর্যন্ত একটি সুসজ্জিত মিছিল হয়। শতাধিক নেতা-কর্মী-সমর্থক এতে অংশ নেন। পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতি ও কমরেড কমল সাঁই নেতৃত্ব দেন।

ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে
বিক্ষোভ পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উত্তর ২৪ পরগণায় গারুলিয়া, ব্যারাকপুর, টিটাগড়, খড়দহ, ভাটপাড়া, কামারহাটি, পানিহাটি, বিধাননগর পৌরসভার পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন ও বিক্ষোভে সামিল হন। পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের গত তিন মাস ইন্সেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে না, বেতন নিয়মিত দেওয়া হয় না, করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে কাজ করলেও সমস্ত স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। এর প্রতিবাদে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতেই ছিল এই বিক্ষোভ।

অন্যান্যদের সাথে এই বিক্ষোভে এ আই ইউ টি ইউ সি-র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের স্বেচ্ছাচারিতা

একের পাতার পর

রাজনৈতিক সভার আয়োজন, পৌষমেলায় দোকান ভাঙচুর, প্রাতিষ্ঠানিক বেনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য এক অধ্যাপককে সাসপেন্ড করা, অধ্যাপকদের প্রতি উপাচার্যের অশোভন আচরণ ও তাঁদের দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার বিরুদ্ধতা করায় প্রতিবাদকারীদের শো-কজ ও কয়েকজনকে সাসপেন্ড করা, গবেষক ও অধ্যাপকদের ভবনে ও গবেষণাগারে প্রবেশ ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি স্বেচ্ছাচারী অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে উপাচার্য গায়ের জোরে চাপিয়ে দিয়েছেন। উপাচার্যের এইসব স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাতে প্রতিবাদ গড়ে উঠতে না পারে, সেই জন্য ছাত্র-গবেষক-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতি দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কোনও অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মী সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে পারবেন না— এমন তালিবানি ফতোয়াও তিনি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ক্ষমতার দম্ভে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সাসপেন্ড হওয়া তিন ছাত্রছাত্রীর সাসপেনশন-এর মেয়াদ অনৈতিকভাবে আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগেই অনলাইন মিটিংয়ে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছেন, সাসপেন্ড হওয়া ছাত্রছাত্রীদের তিনি বহিষ্কার করেই ছাড়বেন। বিশ্বভারতীতে উপাচার্যের এই স্বৈরাচারী কার্যকলাপ বাংলার শিক্ষাজগতে বেমানান।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মদতপুষ্ট হয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ সমগ্র রাজ্যে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষানুরাগী মহল সোচ্চার। তাঁরা বদ্ধপরিকর বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন, গবেষণা, মুক্ত শিক্ষা ও চিন্তার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে শেষ পর্যন্ত লড়বেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com